কপোতাক্ষ নদ বাঁচাও

কপোতাক্ষ নদ সম্পর্কিত তথ্যপত্র

উত্তরণ

ক্যাম্পেইন লীড, কোস্টাল এরিয়া ক্যাম্পেইন গ্রুপ

csrl

ক্যাম্পেইন ফর সাসটেইনেবল রুরাল লাইভলিহুড-সিএসআরএল

কপোতাক্ষ নদ বাঁচাও

কপোতাক্ষ নদ সম্পর্কিত তথ্যপত্র

পরিকল্পনা ও নির্দেশনা

শহিদুল ইসলাম
পরিচালক, উত্তরণ

লিখন

হাসেম আলী ফকির
পরামর্শক, উত্তরণ

গ্রন্থণা ও সম্পাদনা

অধ্যক্ষ এবিএম শফিকুল ইসলাম
সভাপতি, কেন্দ্রীয় পানি কমিটি

গ্রন্থণা ও সম্পাদনা সহযোগী

পীযূষ কান্তি বাড়ৈ
দিলীপ কুমার সানা

প্রকাশ কাল

জানুয়ারী ২০১২

গ্রাফিক্স

অংকুর, তুষার পাল

মুদ্রণ

প্রচারণী প্রিন্টিং প্রেস
৪৪ স্যার ইকবাল রোড, খুলনা
ফোন : ০৪১-৮১০৯৫৭

প্রসঙ্গ কথা

কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা সমস্যা এখন জাতীয় পর্যায়ে বহুল আলোচিত একটি ইস্যু। প্রত্যক্ষভাবে এ নদের উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যা হবে প্রায় ২০ লাখ। বিগত শতাব্দীর ৯০ দশকে কপোতাক্ষ অববাহিকায় জলাবদ্ধতা শুরু হলেও এটি স্থায়ী সমস্যায় পরিণত হয় ২০০০ সাল থেকে। ক্রমশঃ এ সমস্যা তীব্র হচ্ছে এবং নিত্য নতুন এলাকায় তা সম্প্রসারিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের সর্ব দক্ষিণ-পশ্চিমের প্রধান দুটি নদী কপোতাক্ষ ও খোলপেটুয়া। খোলপেটুয়ার সাথে যুক্ত নদী সমূহ যথাক্রমে বেতনা-মরিচ্চাপ-সাপমারা-গলঘষিয়া-কাকশিয়ালী প্রভৃতি এখন মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে। খোলপেটুয়া অচিরেই মৃত্যুমুখে পতিত হবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। অন্যদিকে উজান থেকে প্রতিবছর ৮/১০ কিলোমিটার কপোতাক্ষ নদের অকালমৃত্যু হচ্ছে। কার্যকরী কোন পদক্ষেপ গৃহীত না হলে আগামী ১/২ বছরের মধ্যে পাইকগাছার শিববাড়ী পর্যন্ত কপোতাক্ষ সম্পূর্ণভাবে মৃত নদে পরিণত হওয়ার আলামত এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ নদের অকালমৃত্যু হলে অববাহিকার জনপদে ব্যাপক মানবিক বিপর্যয় ঘটবে। বিশেষ করে দরিদ্র মানুষের পক্ষে এলাকায় টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে। বিগত এক দশক যাবৎ মানুষ তাঁর নিজ এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় চলে যেতে (মাইগ্রেশন) শুরু করেছে। কপোতাক্ষের অকাল মৃত্যু হলে এলাকা বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়বে এবং এলাকা থেকে ব্যাপকভাবে মাইগ্রেশন ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকবে না।

মড়ার উপর খাড়ার ঘা'র মতো জলাবদ্ধতা সমস্যার সাথে যুক্ত হয়েছে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি। প্রতি বছর জোয়ারের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে একদিকে নদী ভাঙ্গন ও নদীর তীর উপচিয়ে প্লাবন যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি জলাবদ্ধতা সমস্যাও প্রকট আকার ধারণ করছে। বর্তমানে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির বিষয়টি জোয়ার-ভাটা এলাকায় সর্বত্র দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। যার ফলে এলাকা থেকে মাইগ্রেশন প্রক্রিয়া আরো দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাবে এমন আশংকা অমূলক নয়।

জনগণের দীর্ঘ প্রত্যাশা ও চাহিদার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কপোতাক্ষ নদের সমস্যা মোকাবেলায় ২৬১ কোটি ৫৪ লাখ ৮৩ হাজার টাকার একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির ফসল। প্রকল্পটি অনুমোদনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শুভ উদ্যোগের জন্য এলাকাবাসী চির কৃতজ্ঞ। আমরা আশা করবো প্রকল্পটিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে এবং প্রকল্পের সকল কাজে জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে। আশা করবো প্রকল্পের সকল কাজে জনগণকে সম্পৃক্ত করা হবে। তা না হলে প্রকল্পের সুফল থেকে এলাকাবাসী বঞ্চিত হতে পারে এবং সমস্যা আরো দীর্ঘায়িত হতে পারে, সেটি কোনক্রমেই কাম্য নয়। এলাকাবাসীর স্বার্থে, কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে কপোতাক্ষ বাঁচানো জরুরী। কপোতাক্ষ বাঁচানোর জনগণের এই আকুতির সাথে যোগ দিয়েছে সিএসআরএল। তাদের সহায়তায় এই তথ্যপত্রের প্রকাশ। সিএসআরএলকে ধন্যবাদ। জলাবদ্ধতা, খাস জমি ও পরিবেশ আন্দোলনে আমাদের দীর্ঘদিনের সাথী অকৃত্রিম বন্ধু মোড়ল আব্দুস সালামকে এই মুহূর্তে গভীরভাবে স্মরণ করছি; যার মৃত্যুতে কপোতাক্ষ পাড়ের বাসিন্দারা তাঁদের এক অকৃত্রিম বন্ধুকে হারিয়েছে।

শহিদুল ইসলাম
পরিচালক, উত্তরণ

কপোতাক্ষ অববাহিকার বন্যা ও জলাবদ্ধতা ২০১১

ইতিহাস ঐতিহ্যখ্যাত কপোতাক্ষ নদ সমুদ্রগামী একটি নদী। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের এটি একটি বৃহত্তম নদী। কপোতাক্ষ মাথাভাঙ্গার অন্যতম শাখা নদী। দর্শনার উপরে মাথাভাঙ্গা ও ভৈরবের যুক্তপ্রবাহ থেকে এ নদের উৎপত্তি। এ নদ দামুড়হুদা সদর উপজেলার নিম্নাংশ দিয়ে ভৈরবের সাথে মিলিত হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা জেলায় এ নদীর পুরাতন গতিপথ কোথাও লুপ্ত আবার অনেক জায়গায় এর অস্তিত্ব খুঁজেও পাওয়া যায়। কিন্তু এ জেলায় কপোতাক্ষ তার স্বনামে পরিচিত নয়। ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর ও কোটচাঁদপুর উপজেলায় কপোতাক্ষ স্বনামে পরিচিত যদিও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নথিপত্রে এ অংশকে ভৈরব নামে অভিহিত করা হয়েছে। বর্তমানে চৌগাছার তাহিরপুর থেকে দর্শনা পর্যন্ত নদীকে ভৈরব নদী হিসাবে ধরা হচ্ছে। তাহিরপুর থেকে দর্শনার সীমান্ত চেকপোস্ট পর্যন্ত এ নদীর দূরত্ব প্রায় ১১০ কিমি। এই এলাকার বর্ষার পানি কপোতাক্ষ নদ দ্বারা নিষ্কাশিত হয়। সুতরাং এ অংশকে কপোতাক্ষ নদের অন্তর্ভুক্ত এলাকা হিসাবে গণ্য করা সমীচিন হবে। এ এলাকার মধ্যে রয়েছে চুয়াডাঙ্গা জেলার চুয়াডাঙ্গা সদর, দামুড়হুদা ও জীবননগর উপজেলা এবং ঝিনাইদহ জেলার কোটচাঁদপুর ও মহেশপুর উপজেলা। মোট ৫টি উপজেলা, ১৯টি ইউনিয়ন, ২২৪টি গ্রাম, ক্যাচমেন্টভুক্ত এলাকা ৫৯৫৯৪ হেক্টর এবং নির্ভরশীল জনসংখ্যা ৫৯৮৫৪০ (উত্তরণ ও পানি কমিটির সার্ভে)।

অন্যদিকে পাইকগাছার রাড়ুলী থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত অংশ মূল কপোতাক্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে (৮৪ কিমি)। এই বিচ্ছিন্ন অংশে রয়েছে খুলনা জেলার পাইকগাছা ও কয়রা উপজেলা এবং সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি ও শ্যামনগর উপজেলা। ৪টি উপজেলার ইউনিয়ন সংখ্যা ১৫টি, গ্রাম সংখ্যা ২০৭টি, এলাকার পরিমাণ ৭৪১০৮ হেক্টর এবং জনসংখ্যা ৫৮৪৮৮২ জন। বর্তমান পানি উন্নয়ন বোর্ডের রেকর্ডপত্র ও কার্যক্রমে কপোতাক্ষ নদ বলতে ধরা হচ্ছে চৌগাছা উপজেলার তাহিরপুর থেকে পাইকগাছার শিববাড়ী পর্যন্ত প্রায় ২০০ কিমি অববাহিকা। এ অবাহিকার পরিসংখ্যান নিম্নে দেওয়া হল।

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন সংখ্যা/ পৌরসভা	গ্রাম সংখ্যা	ক্যাচমেন্ট এলাকা হেঃ	নির্ভরশীল জনসংখ্যা
ঝিনাইদহ	মহেশপুর	৩	২৪	৩৪৯৮	৩৫২৪১
যশোর	চৌগাছা	৯	১২২	২১৪২৫	১৮০৫৯১
	যশোর সদর	১	১৬	২৮১২	৩৭৩৩২
	ঝিকরগাছা	১০	৯৯	১৭৮২২	২১৫৫৪০
	মণিরামপুর	৬	৫৯	১২১১৩	১২৫৫০৯
	কেশবপুর	৩	৪০	৬২২৫	৭৫৮৪০
সাতক্ষীরা	কলারোয়া	৪	৩৫	৬৫৯৩	৬৫৯৪৭
	তালা	১১	১২৩	১৭৬৫০	১৯৩৬৩৩
খুলনা	পাইকগাছা	৬	২৯	৯৯২১	৬৭৬৭৩
সর্বমোট	৯টি	৫৩	৫৪৭	৯৮০৫৯	৯৯৭৩০৭

(উত্তরণ ও পানি কমিটির সার্ভে)

২০১১ সালের বন্যা ও জলাবদ্ধতা

গত শতাব্দীর নব্বই দশকে কপোতাক্ষ অববাহিকায় জলাবদ্ধতা সমস্যা স্পষ্ট হয়ে উঠে। ২০০০ সাল থেকে জলাবদ্ধতা সমস্যা বন্যার আকারে আবির্ভূত হয় এবং প্রতি বছর তা নিয়মিতই ঘটছে। প্রতি বছর জোয়ারের প্রান্তসীমা থেকে ৮/১০ কিলোমিটার নদীর অকাল মৃত্যু হচ্ছে, সাথে সাথে সেই সব এলাকায় জলাবদ্ধতার সম্প্রসারণ ঘটে চলেছে। বিগত ৪/৫ বছর বর্ষা মৌসুমে খরার প্রাদুর্ভাব দেখা গেছে। আগষ্ট মাস পর্যন্ত এ বছর বৃষ্টিপাত হয়েছে ১৭০০ মিমি যা গত বছরের তুলনায় ৩৫-৪০ ভাগ বেশী।

২০১১ সালের জলাবদ্ধতার পরিসংখ্যান

জেলা	উপজেলা	ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাম	ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার	ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত ফসল (হেঃ)	ক্ষতিগ্রস্ত নলকূপ	আশ্রিত জনসংখ্যা
যশোর	কেশবপুর	৭৮	১২৯৩৭	৬৩৩৮৮	৬১৯৮	৯১৭	৪৪২৪
	মণিরামপুর	৬১	১০১৫৪	৪৯৭৫২	৪২৫৭	৪৫৮	২০১১
	ঝিকরগাছা	৩৭	৬৫২৩	৩০৪৪৫	২৪৫৮	২৭৮	১০২০
সাতক্ষীরা	কলারোয়া	৬৫	১১২৫৯	৫৪২৯৫	৭১১৫	৬০৫	১০৪৭৩
	তালা	১৫৯	৩৯৫১৮	১৭৮৫৯০	২০২০৩	২৫৪৫	১৭৬৬৭'
খুলনা	পাইকগাছা	২৭	৫৪৪৫	২৫২২৫	২৩০২	২৭২	১২০৩
মোট	৬টি	৪২৭	৮৫৮৩৬	৪০১৬৯৫	৪২৫২৩	৫০৪৫	৩৬৭৯৮

(তথ্য সূত্রঃ উপজেলা প্রশাসন ও ইউনিয়ন পরিষদ)

উল্লিখিত পরিসংখ্যান পুরো উপজেলার ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ নয়, উপজেলাগুলোর কেবলমাত্র কপোতাক্ষ ক্যাচমেন্ট এলাকার ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। সরকারী বে-সরকারী উৎস থেকে এ পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হয়েছে।

জলাবদ্ধতার ধরণ ও তার প্রভাব

পূর্বে জলাবদ্ধতা বিলখালের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, এখন বৃষ্টির পরিমাণ একটু বৃদ্ধি পেলে জল বিল খাল ছাপিয়ে বা নদী পাবিত করে জনবসতি এলাকায় প্রবেশ করে। স্থানবিশেষ ২ থেকে ৬ মাস পর্যন্ত বসতি এলাকায় জল আবদ্ধ থাকে। কোন কোন বিল এলাকা থাকে সারা বছর জলমগ্ন। দেখা দেয় তীব্র খাদ্য সংকট, সুপেয় পানির অভাব, কর্মসংস্থানের অভাব, রোগব্যাধির প্রাদুর্ভাব এবং আবাসন সংকট। প্লাবিত হয় রাস্তাঘাট। কৃষি, স্বাস্থ্য শিক্ষা, মৎস্য, পশু সম্পদ, বনায়ন, যোগাযোগ সহ আর্থ সামাজিক সকল সেক্টরই জলাবদ্ধতা দ্বারা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তালা উপজেলা পরিষদ পানির নিচে

এলাকায় বসতির ধরণ এমন যে ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষরা সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত উঁচু এলাকায় এবং দরিদ্র মানুষরা নীচু এলাকায় বিশেষ করে বিলের ধারে বসবাস করে। এরাই আগে বন্যা কবলিত হয়ে পড়ে এবং এদের ঘরবাড়ী নড়বড়ে হওয়ার দরুণ বন্যায় আক্রান্ত হয়ে বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। তখন এরা নিকটস্থ কোন আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এক্ষেত্রে নারী ও শিশুদের অবস্থা বেশী সংকট জনক হয়ে পড়ে।

যারা প্লাবিত এলাকার মধ্যে বসবাস করে তারা প্রতিনিয়ত ভোগে সাপের আতংকে, না জানি কখন মেটে ঘরের দেয়াল ধ্বসে পড়ে, শিশুদের সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখতে হয়। বাড়ী থেকে অন্যত্র যাওয়ার জন্য মানুষ কলার ভেলা, তালের ডিঙ্গি বা ছোট নৌকা ব্যবহার করে, অনেক জায়গায় তৈরী করা হয় বাঁশের সাঁকো। গৃহপালিত পশুর জন্য বাসস্থান ও খাবার যোগাড় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এলাকার জীবিকার প্রধান ক্ষেত্র হলো কৃষি ও মৎস্য সেক্টর। এ দুটি বিপর্যস্ত হওয়ায় বিকল্প জীবিকা মানুষের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় গৃহপালিত পশু, আসবাব সামগ্রী, গাছ-গাছালী প্রভৃতি বিক্রি করে মানুষদের জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। যাদের সে সুযোগ নেই, তারা চড়া মূল্যে ধারদেনা করে। অনেক হতদরিদ্র ও দুঃস্থ পরিবার উপায়ন্তর না দেখে ভিক্ষা করতে বাধ্য হয়, বিলখাল থেকে শাপলা-শামুক কচুঘেচু খেয়ে জীবন ধারণ করে। প্রতি বছর জলাবদ্ধতা নিয়মিত ঘটনা হওয়ায় এলাকা থেকে অনেক পরিবার এলাকা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেছে।

ভাঙ্গন ও জোয়ারের প্লাবন

কয়েক বছর যাবৎ কপোতাক্ষের নিম্ন অববাহিকায় দেখা দিয়েছে উচ্চ জোয়ারের দ্বারা নদী ভাঙ্গন এবং তীর উপচিয়ে জোয়ারের প্লাবন। ৩/৪ বছর আগেও পাটকেলঘাটা থেকে তালা বাজার পর্যন্ত (১৪কিমি) জোয়ারের ভাঙ্গন ও প্লাবন অব্যাহত ছিল।

পাটকেলঘাটা বাজার, ইসলামকাটি বাজার, মাগুরা বাজার এবং তালা বাজারে ভরাগোণে (তেজকটাল) জোয়ার দ্বারা প্লাবিত হতো, বিভিন্ন বাঁকের চরার অপর পাড়ে ভাঙ্গন দেখা দিতো। কিন্তু এখন এ এলাকায় জোয়ার আর উঠতে পারে না। তালার নিম্নে জোয়ার মাত্র ঘন্টাখানেক সময় স্থায়ী হয়, যার পানি প্রবাহের গতিবেগ খুবই ক্ষীণ।

বর্তমানে কপিলমুনি থেকে শিববাড়ীর শিবসা পর্যন্ত (৩২ কিমি) একদিকে ভাঙ্গন অন্যদিকে জোয়ারের প্লাবন ঘটে চলেছে। এলাকাবাসীর অভিমত প্রতি বছর এর তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নদী যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানেই এ ভাঙ্গন ও প্লাবন গুলো সংঘটিত হয়। নদীর যে পাড়ে ভূগঠন প্রক্রিয়া প্রায় সম্পন্ন হয়ে তীরবর্তী এলাকা উচু হয়ে যায় সেখানে গড়ে উঠে শহর-বন্দর-বাজার, অপর পাড়ে পলি জমে গড়ে উঠে চরাভূমি। বিগত ৫/৬ বছর এ চরাভূমিতে বর্ধিত হারে পলি জমে বাঁকগুলো অপ্রশস্ত হয়ে পড়েছে, ফলে অমাবশ্যা ও পূর্ণিমার গোণে

এবং বর্ষাকালে অপ্রশস্ত ও অগভীর নদী জোয়ারে পানির চাপ ধারণ করতে পারছে না। উঁচু পাড়গুলো ভেঙ্গে নদী গর্ভে বিলীন হচ্ছে এবং উভয় পাড়ের তীরবর্তী এলাকা জোয়ার দ্বারা প্লাবিত হচ্ছে। কপিলমুনি, জেঠুয়া, বালিয়া, আগরদাড়ি, বোয়ালিয়া প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ও ঐতিহ্য সমৃদ্ধ বাজার এখন হুমকির সম্মুখীন। বিশেষজ্ঞদের ধারণা জোয়ারের ভাঙ্গন ও প্লাবনের পিছনে অপ্রশস্ত এবং অগভীর নদী ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সম্পর্ক রয়েছে।

জলাবদ্ধতার কারণ

ক. পোল্ডার ব্যবস্থার প্রবর্তন

উপকূলীয় এলাকার পলি ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশগত বিষয় আদৌ বিবেচনা না করে বিগত শতাব্দীর ৬০ এর দশকে বাস্তবায়িত হয় উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প (Coastal Embankment project) যা পোল্ডার বা ওয়াপদার বাঁধ নামে এলাকায় বহুলভাবে প্রচলিত। পোল্ডার করার উদ্দেশ্য ছিল লবণাক্ততা ও জলোচ্ছ্বাস থেকে উপকূলের প্লাবন ভূমিকে রক্ষা করা এবং প্লাবনভূমিকে কৃষিজমিতে পরিণত করে সারা বছর চাষাবাদের উপযোগী করা।

পোল্ডারের বৈশিষ্ট্য ঃ

- নদীর দুই তীর বরাবর উঁচু ও মজবুত করে বাঁধ নির্মাণ করা হয়। এ বাঁধের কাজ হলো পোল্ডারের মধ্যে যাতে নোনা পানি, বন্যার পানি ও জলোচ্ছ্বাস প্রবেশ করতে না পারে।
- পোল্ডারের অভ্যন্তরের বর্ষার পানি নিষ্কাশনের জন্য তৈরী করা হয় স্লুইজ গেট।

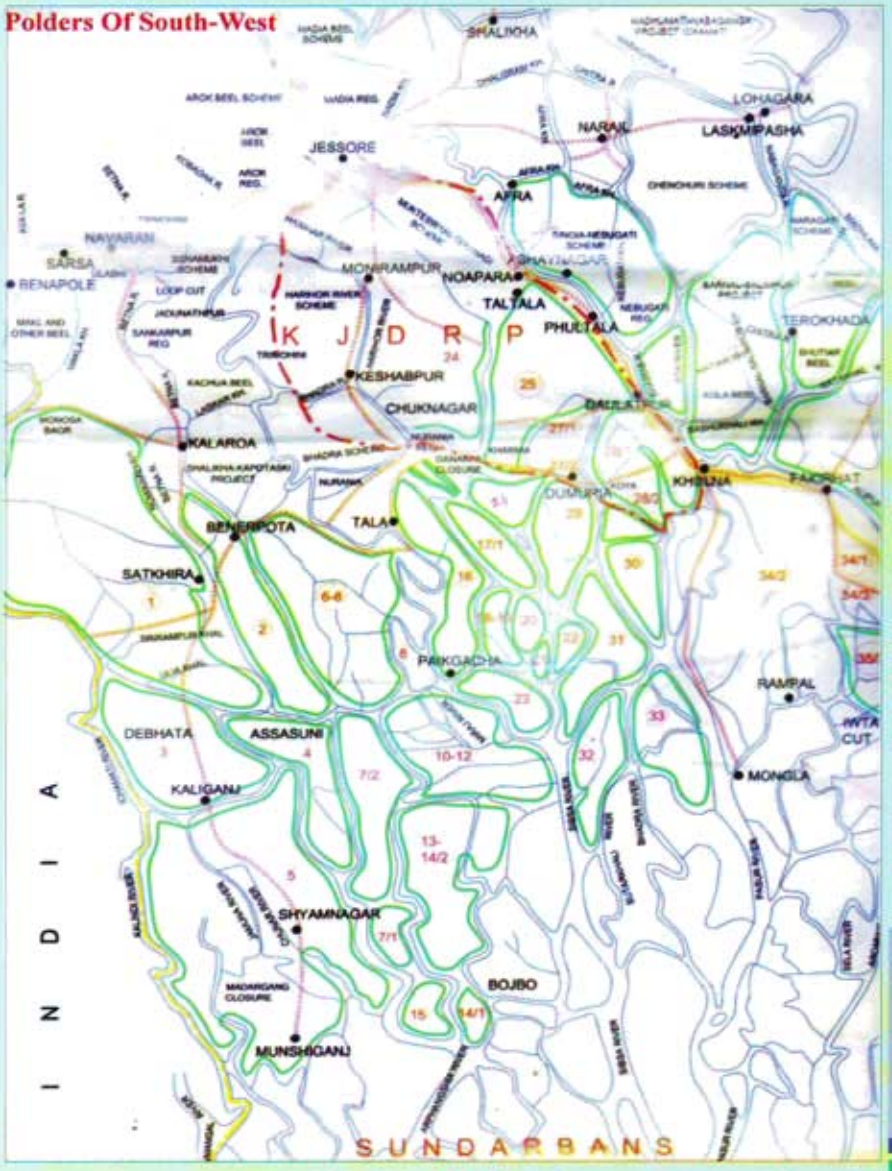

এ ব্যবস্থার আওতায় মূল কয়েকটি নদীকে কোনরকমে জীবিত রেখে জালের মতো বিস্তৃত অসংখ্য নদীকে হত্যা করা হয়। মূল নদীগুলোও বিল, জলাভূমি বা জনপদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। জোয়ার-ভাটা সীমাবদ্ধ হয়ে যায় নদীর মধ্যে। ফলে নদীর বুক পলি জমে জমে উঁচু হতে হতে ১০-১৫ বছরের মধ্যে বিলের লেভেল থেকেও উঁচু হয়ে পড়ে। তখন বর্ষার পানি আর বিল থেকে নির্গমন হতে পারেনা। দেখা দেয় জলাবদ্ধতা এবং এটি সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় উত্তর থেকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

খ. পদ্মা বা মাথাভাঙ্গা প্রবাহ থেকে এলাকার বিচ্ছিন্নতা

যশোর-খুলনা-সাতক্ষীরা জেলার জলাবদ্ধ নদীগুলো মাথাভাঙ্গা নদীর সাথে যুক্ত ছিল। প্রায় দেড়শ বছর আগে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থেকে ভৈরব নদী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, ফলে আমাদের এলাকা পদ্মা নদীর মিষ্টি প্রবাহ থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে জলাবদ্ধ এলাকার নদী সমূহের পলি অপসারণ ক্ষমতা কমে যায়, পানির লবণাক্ততার তীব্রতা বৃদ্ধি পায় এবং ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তর নীচে মাত্রা নেমে যায়।

গ. সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও ভূমির নিম্নগমন

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে সাম্প্রতিক আলোচিত ভয়াবহ বিষয় হলো সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে দক্ষিণ অঞ্চলের পোল্ডারের বাঁধ আরো ৩ ফুট উঁচু করে নির্মাণ করা হচ্ছে। যে সব এলাকায় পূর্বে জোয়ার দ্বারা প্লাবিত হতো না সে সব অনেক এলাকা এখন জোয়ার দ্বারা প্লাবিত হচ্ছে এবং প্রতি বছর প্লাবিত হওয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সব প্লাবন প্রতিরোধের জন্য নদীতীরে স্থানীয় জনগণ নির্মাণ করছে ছোট ছোট বাঁধ।

নদীতে জাল-পাটা দিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি

অন্যদিকে ঘটে চলেছে ভূমির অবনমন বা ভূমি বসে যাওয়া (Earth Subsidence)। আমাদের এ এলাকা নতুন পলিমাটি দ্বারা গঠিত, অতীতে এ এলাকা সুন্দরবনের অন্তর্গত থাকায় মাটির তলে রয়েছে বিভিন্ন গাছপালা যার সংমিশ্রণে এখানকার মাটি জোব বা পীট মাটিতে পরিণত হয়েছে যা সংকুচিত হয়ে মাটি দেবে যাওয়ার হার বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকা থেকে অনেক বেশী। পোল্ডারের পূর্বে পলি জমে বসে যাওয়ার হার পূরণ হতো এবং ভূমি হতো আরো উঁচু। কিন্তু পোল্ডার প্রবর্তনের পরে ভূমি গঠন হচ্ছে না কেবল বসে যাচ্ছে। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো টেকটোনিক মুভমেন্ট। সম্প্রতি বিশেষজ্ঞ মহলে এ বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচিত হচ্ছে যে, মহাদেশীয় যে টেকটোনিক বলয়ে আমরা বাস করছি তাতে পার্শ্ববর্তী টেকটোনিক বলয়ের চাপে বা সংঘর্ষে আমাদের এলাকা ক্রমান্বয়ে নীচু হচ্ছে এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা উঁচু হয়ে পড়ছে। ফলে ভূমি বসে যাওয়া, নীচু হওয়া এবং সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে এলাকায় জলাবদ্ধতার তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ঘ. নিষ্কাশন পথে বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি

জলাবদ্ধতা সৃষ্টির পিছনে মানুষের অপরিণামদর্শী হস্তক্ষেপ অনেকাংশে দায়ী। নদীর চর জেগে উঠার সাথে সাথে তা কায়েমী স্বার্থবাদীদের দখলে চলে যাচ্ছে, মৎস্য ঘের করে বিলের মধ্যে খাল-নালাগুলো অবরুদ্ধ করা হচ্ছে, নদীখালে বিভিন্ন ধরণের মাছ ধরার যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হচ্ছে। নদীখালে জন্মেছে কচুরিপনা, শ্যাওলা ও বিভিন্ন ধরণের আগাছা। স্লুইজ গেট গুলোতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের যান্ত্রিক ত্রুটি বিচ্যুতি এবং গেটগুলো জনস্বার্থে পরিচালিত না হয়ে পরিচালিত হয় মৎস্যচাষীদের স্বার্থে। স্লুইজ গেটের আগে-পিছে খালে পলি জমে নিষ্কাশন পথে বাধা সৃষ্টি হয়। এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ যেমন নদীতে ছোট ব্রীজ নির্মাণ, সাঁকো নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ খালের উপর ছোট ছোট ব্রীজ কালভার্ট নির্মাণ প্রভৃতি পানি নিষ্কাশন পথে বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে।

সমস্যা সমাধানে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

২০০০ সালের ভয়াবহ জলাবদ্ধতার পর সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে একাধিকবার বিভিন্ন ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ড্রেজার মেশিনদ্বারা নদীখনন এবং ম্যানুয়ালী ঝুড়ি কোদাল দ্বারা নদী খনন। কিন্তু এর দ্বারা ফলপ্রসূ তেমন কোন ফলাফল অর্জিত হয়নি। অর্থাৎ কপোতাক্ষ নদ ভরাট হওয়া বন্ধ করা যায়নি বরং ঐ সব পদক্ষেপের দরুণ নদীর অকাল মৃত্যুকে আরো ত্বরান্বিত করা হয়েছে। এসবের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সহযোগি প্রতিষ্ঠান CEGIS ২০০৪ সালে এলাকা ষ্টাডি করে সুপারিশ করে যে, অববাহিকার ঝাঁপা বাওড়ে জোয়ারাধার অর্থাৎ ভবদহ এলাকার অনুরূপ টিআরএম বাস্তবায়ন করতে হবে, পানি উন্নয়ন বোর্ড বিগত ৭ বছরের মধ্যে সে প্রস্তাব কার্যকরী করেনি। সেই সময়ে টিআরএম বাস্তবায়ন করলে কপোতাক্ষের বর্তমান এ দশা ঘটতো না।

বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে পানি উন্নয়ন বোর্ড যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নদীতীরে বাঁধ নির্মাণ এবং যান্ত্রিক উপায়ে নদীতে প্রণালী সৃষ্টি করা। কপোতাক্ষ তীরবর্তী যেসব এলাকা ব্যাপকভাবে প্লাবিত হয় এমন কিছু এলাকায় নদীতীরে বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে, এতে ঐসব এলাকায় জলাবদ্ধতার কিছুটা প্রশমন হলেও এর ফলে অন্যান্য এলাকায় বিশেষ করে নিম্ন অববাহিকায় জলাবদ্ধতার সম্প্রসারণ ঘটেছে। যেমন তালা এলাকা। নদীতে যান্ত্রিকভাবে প্রণালী সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো যেসব এলাকায় নদীর বুকে পলি জমে অত্যধিক উঁচু হয়ে পড়েছে সেইসব এলাকায় প্রণালী সৃষ্টি করে পানি নিষ্কাশন। যেখানে ২০-২৫ কিমি নদীতে প্রণালী সৃষ্টি করতে হবে সেখানে মেশিন দ্বারা দীর্ঘ এতটা নদীর বুক খনন করে প্রণালী করা সম্ভব হয়ে উঠে না, বরং দেখা যায় নদীর খননকৃত অংশ আবার পলি দ্বারা ভরাট হয়ে যায় এবং পশ্চাতে আরো পলি জমে ভরাট হয়ে জলাবদ্ধতার সম্প্রসারণ ঘটে। বিগত বছর সমূহের অভিজ্ঞতায় এটি স্পষ্ট হয়েছে যে পলিকে বিলের মধ্যে উঠানোর সুযোগ সৃষ্টি করা না হলে পরিস্থিতির অবনতি ছাড়া উন্নতি করা সম্ভব নয়।

উত্তরণ ও পানি কমিটির ভূমিকা

যশোর-খুলনা-সাতক্ষীরা অঞ্চলে পানি কমিটি ও উত্তরণ দীর্ঘ ২৫ বছর যাবৎ জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, সুপেয় পানি নিশ্চিত করা এবং পরিবেশ সমস্যা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। পানি কমিটির সাংগঠনিক কাঠামো উক্ত ৩টি জেলার ১২টি উপজেলায় বিস্তৃত।

পানি কমিটি উত্তরণ প্রতিষ্ঠিত একটি স্বাধীন সংগঠন। সমাজের বিভিন্ন প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তির সমন্বয়ে পানি কমিটি গঠিত। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার উদ্যোগী মানুষ পানি কমিটির সাথে সম্পৃক্ত। বিল ডাকাতিয়া ও ভবদহ এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য কেজেডিআরপি প্রকল্পের বিরুদ্ধে পানি কমিটি জনগণকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং জাতীয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ্যাডভোকেসী লবিং কাজ সম্পন্ন করেছে। টিয়াবুনিয়া ও কাশিমপুর রেগুলেটর নির্মান কার্যক্রম বন্ধ করা, টিআরএম প্রতিষ্ঠা ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা, দাতা সংস্থা এডিপি কর্তৃক কেজেডিআরপি কার্যক্রম মূল্যায়ন প্রভৃতি পানি কমিটির দীর্ঘ কার্যক্রমের ফসল।

কপোতাক্ষ নদের সমস্যা সমাধানকল্পে এমপি ও পাউবো'র সাথে মিটিং

বিগত ২০০০ সাল থেকে উত্তরণ ও পানি কমিটি কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা সামাধানকল্পে বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ২০১১-র জলাবদ্ধতা দূরীকরণে ব্যাপক ভূমিকা গ্রহণ করা হয় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জন সমাবেশ, মিছিল, মানব বন্ধন, ঘেরাও, প্রেস কনফারেন্স, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন প্রকাশ, জেলা প্রশাসন ও বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান, বিকল্প পথে পানি নিষ্কাশন এবং ব্যাপকভাবে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

বিভাগীয় কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি প্রদান

জলাবদ্ধতা মোকাবেলায় দাবীসমূহ

১. ত্রাণ ও পুনর্বাসন

- অবিলম্বে এলাকাকে দুর্গত এলাকা হিসাবে ঘোষণা প্রদান।
- পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা।
- দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা।
- সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃ স্থাপন।

২. স্থায়ীভাবে সমাধান

- সাপমারা, লাবণ্যবতী, মরিচ্চাপ নদীর সাথে ইছামতি ও বেতনা নদীর সরাসরি সংযোগ সৃষ্টি অথবা এই নদীগুলোর অববাহিকায় জোয়ারাধার ব্যবস্থাপনা চালু করা।
- কপোতাক্ষ, বেতনা, শালিখা ও সালতায় জোয়ারাধার ব্যবস্থা চালু করা।
- এলাকার নদীগুলো পুনঃখনন করা।
- নদীখাল সকল ধরনের দখলমুক্ত করা এবং অপরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণ না করা।

খুলনা প্রেস ক্লাবে সমাবেশ

জনগণের পরিকল্পনাঃ কপোতাক্ষ নদ

বাংলাদেশ পলিমাটির দেশ। দেশের ৮০ভাগ ভূমি পলিমাটি দ্বারা গঠিত। নদীমাতৃক দেশ, নদীই হচ্ছে বাংলাদেশের প্রাণ। নদী বাহিত পলিমাটি দ্বারা এখানকার উর্বর ভূমি গঠিত হয়েছে। ভৌগলিক ভাষায় গঠিত এ ভূমিকে বলা হয় বদ্বীপ ভূমি। বদ্বীপ ভূমির মানুষ হাজার হাজার বছর যাবৎ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পানির সাথে সহাবস্থান করে বসত করে আসছে। পানি ব্যবস্থাপনার মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে জনগণ, সরকারী ভূমিকা থাকে পৃষ্ঠপোষকতামূলক।

যেহেতু জনগণ পানির সাথে বসতি স্থাপন করে সে জন্য জনগণই জানে কিভাবে পানির সাথে জীবন জীবিকার সম্পর্ক হবে। এই লোকায়ত জ্ঞান হাজার হাজার বছর ধরে পূর্ব পুরুষানুক্রমে পরবর্তী বংশধররা বহন করে চলে। পানি ব্যবস্থাপনার মূল বিষয় প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান এবং প্রকৃতির সংগে সামঞ্জস্য বিধান করে চলা।

এলাকার ভূ-প্রকৃতি

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল গাঙ্গেয় বদ্বীপ ভূমির অংশ। বিশেষ করে উপকূলীয় জেলা যশোর-খুলনা-সাতক্ষীরা অঞ্চলের দক্ষিণে রয়েছে বিশ্ব ঐতিহ্যখ্যাত সুন্দরবন। সুন্দরবন, সমুদ্র, নদ-নদী, প্লাবন ভূমি ও পদ্মা প্রবাহের সমন্বয়ে এলাকার ইকোসিস্টেম গঠিত হয়েছে। পলি ও পানি ইকোসিস্টেমের প্রধান বিষয়। নদীবাহিত পলিমাটি দ্বারা এলাকার ভূমি গঠিত। পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে বেশী পলি বহন করে গঙ্গা নদী এবং এই পলি মাটির উর্বরতা শক্তিও অনেক বেশী।

বর্ষার সময় নদীয় কূল উপচিয়ে এবং জোয়ারে আসা পলি পড়ে এই উভয় প্রক্রিয়ায় উপকূল এলাকার ভূ-গঠন হতো। পদ্মা প্রবাহের মিষ্টিপানি উপকূলের লবণাক্ত পানির সাথে মিশ্রিত হয়ে এলাকা Brackish জোনে পরিণত হয়েছে। এর সাথে সুন্দরবন যুক্ত হওয়ায় এখানকার ইকোসিস্টেম উপকূলীয় অন্যান্য এলাকা থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। এখানকার গাছপালা- পশুপাখি এবং জলজ প্রাণীর ভিন্নতা দেখলে বিষয়টি সহজে অনুমান করা যায়।

পোল্ডার পূর্বাবস্থায় এখানকার নদীগুলো প্রত্যহ দুবার জলাভূমি বা প্লাবন ভূমিকে প্লাবিত করতো। জোয়ার প্রবাহের সাথে থাকতো পলি, খাদ্যকণা ও বিশেষ ধরনের জলজ প্রানি ও উদ্ভিদ যাদের জীবন চক্র নির্ভরশীল ছিল জলাভূমি, নদী এবং সুন্দরবনের উপর। প্লাবনভূমি থাকতো মাছ সহ বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদে ভরপুর। এ প্রক্রিয়ায় নীচুভূমি উঁচু হয়ে ভূমি গঠন হতো এবং নদীর নাব্যতার কোন সমস্যা হতো না।

পোল্ডার পূর্ব অবস্থায় পানি ব্যবস্থাপনাঃ অষ্টমাসী বা দশের বাঁধ

পোল্ডার ব্যবস্থার পূর্বে এলাকার ৮০-৮৫ ভাগই ছিল প্লাবনভূমি যা দিনে দুবার জোয়ারের দ্বারা প্লাবিত হতো। বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত থেকে জানা যায় যে, প্রায় দেড়শো-দুশো বছর পূর্বে এখানকার অধিকাংশ বিল এলাকাগুলোতে ছিল সুন্দরবন। সুন্দরবন কেটে এখানে বসতি স্থাপন করা হয়। ফলে স্বাভাবিক জোয়ারে বা ভরাগোণে নীচু বসতি এলাকা জোয়ার দ্বারা প্লাবিত হতো। সে জন্য এলাকার মানুষ জোয়ারের প্লাবন প্রতিরোধের জন্য নির্মাণ করতো গ্রাম প্রতিরক্ষা বাঁধ, আর বিলে ফসল করার জন্য নির্মাণ করা হতো অষ্টমাসী বাঁধ। উভয় ধরণের বাঁধ নির্মাণকে দশের বাঁধ বলা হয়, কেননা গ্রামের সকল অধিবাসীর সমন্বয়ে এ ধরণের বাঁধ নির্মাণ হতো।

ফসল মৌসুমে বিলের অপেক্ষাকৃত উঁচু অংশ বাঁধ দিয়ে ঘিরে ফেলা হতো এবং বিলের গভীর অংশে সারা বছর জোয়ার ভাটা প্রবাহিত হতো, এটি ছিল প্রকৃতির সঙ্গে এক ধরণের আপোষরক্ষা মূলক সহাবস্থান। এই প্রক্রিয়ায় জলাভূমি যেমন রক্ষা পেতো তেমনি নদীর নাব্যতার তেমন কোন সমস্যা হতো না। এলাকা ছিল মাছে ভাতে স্বয়ং সম্পূর্ণ ও উদ্বৃত্ত এলাকা।

পলিমাটি ব্যবস্থাপনা

আগেই বলা হয়েছে আমাদের এ অঞ্চলের ভূমি পলিমাটি দ্বারা গঠিত। উজান থেকে অর্থাৎ পদ্মা প্রবাহ থেকে আগত বন্যার পলি এবং প্রতিদিনের জোয়ারের পলিদ্বারা এখানকার প্লাবনভূমি গঠিত হচ্ছিল। কিন্তু পোল্ডার ব্যবস্থার কারণে এ দুটি প্রক্রিয়া এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে পলিমাটি দ্বারা এখন নদী ভরাট হচ্ছে, সুন্দরবনের ভূমি উঁচু হচ্ছে এবং সমুদ্র মোহনার গভীরতা হ্রাস পাচ্ছে।

পর্যাপ্ত পরিমাণে ভূমি চাষাবাদ, গাছপালা উজাড় হওয়া প্রভৃতি কারণে ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, নদী ভরাটের কারণে নদী ভাঙ্গন অব্যাহত আছে। এসবের কারণে পূর্বের তুলনায় নদীতে পলির আগমন ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধির জন্য নদীর পানিতে পলিধারণ ও অবক্ষেপনের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। নদী ভরাটের পাশাপাশি পলির একটা উল্লেখযোগ্য অংশ অবক্ষেপিত হয় সুন্দরবনে যার ফলে সুন্দরবনের অনেক এলাকায় ভরাগোণে (ভরাকটাল) ছাড়া স্বাভাবিক জোয়ার উঠতে পারে না। সুন্দরবনের নদীখাল ভরাট হচ্ছে, বৃক্ষের শ্বাসমূল আচ্ছাদিত হচ্ছে এবং এসবের কারণে সুন্দরবনের অস্তিত্ব এখন হুমকির মুখে।

জানুয়ারী থেকে মে মাস পর্যন্ত পলি মৌসুম ধরা হয়। ৮০-৮৫ ভাগ পলি এ মৌসুমে নদীতে অবক্ষেপিত হয়। জানুয়ারী মাস থেকে ক্রমান্বয়ে পলির আগমন বৃদ্ধি পায়। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু এবং সমুদ্র স্রোতের কারণে দক্ষিণ ভারতীয় এবং মেঘনা মোহনার পলির উলেখযোগ্য অংশের অনুপ্রবেশ ঘটে আমাদের এ এলাকায়।

সুতরাং একথা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা যে সুষ্ঠু পলি ব্যবস্থাপনা ছাড়া এখানকার জলাবদ্ধতা ও পরিবেশ সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। জনগণ উদ্ভাবিত একটি সহায়ক পদ্ধতি হলো পলিকে বিলের মধ্যে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া। পলি অবক্ষেপণে বিলের ভূ-গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে, নদী নাব্য থাকবে, সুন্দরবনের উন্নয়ন ঘটবে এবং এখানকার পরিবেশ উন্নয়নে এ পদ্ধতি হবে সহায়ক। অন্যদিকে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও ভূমির নিম্নগমন এ দুটি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হলে পলি দ্বারা ভূ-ভাগ উঁচু করা ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করে কাংখিত ফলাফল পাওয়া যাবে না।

টিআরএম

টিআরএম হলো বিলের মধ্যে জোয়ার ভাটা চালু করা। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে নদী তীরে বাঁধ কেটে সরাসরি বিলের মধ্যে জোয়ার প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়া হয়। রাতদিন ২৪ ঘন্টায় বিলের মধ্যে দুইবার জোয়ার এবং দুইবার ভাটা হয়। জোয়ারের সাথে আগত পলি বিলের মধ্যে জমা হয় এবং পলি মুক্ত পানি ভাটার সময় বের হয়ে যায়। এতে নদী বক্ষে পলি অবক্ষেপিত হতে পারে না বরং নদী ক্রমান্বয়ে গভীর থেকে গভীরতর হয় এবং নীচু বিল পলি জমে উঁচু হয়ে সারা বছর চাষাবাদের উপযোগী হয়।

অতীতে বিল ডাকাতিয়া, বিল ভায়না, বুড়লী-পাথরা প্রভৃতি বিলে এ পদ্ধতি সফল বলে প্রমাণিত হয়েছে যার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারীভাবে ভবদহ এলাকার বিল কেদারিয়ায় এ পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হয়। বর্তমানে খুকশি বিলে এ পদ্ধতি চালু আছে। সরকারীভাবে এ পদ্ধতির নাম Tidal River Management, সংক্ষেপে TRM এবং বাংলায় জোয়ারভাটার নদী ব্যবস্থাপনা বা জোয়ারাধার ব্যবস্থাপনা। এ পদ্ধতি জনগণ উদ্ভাবিত পদ্ধতি। সরকারীভাবে এ পদ্ধতির স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে 'টিআরএম পদ্ধতি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাভজনক, প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে বাস্তবায়নযোগ্য, পরিবেশ বান্ধব এবং জনগণের কাছে খুবই গ্রহণযোগ্য'।

বিশেষজ্ঞগণ এ ধরণের অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সমস্ত উপকূলীয় এলাকায় পানি ও পলি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি একটি বিশাল সম্ভাবনার ক্ষেত্র তৈরী করেছে। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উপকূল এলাকাতেও এ পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে। কপোতাক্ষ নদের সমাধানকল্পে ২০০৪ সালে CEGIS তার ষ্টাডি রিপোর্টে ঝাঁপা বাওড়ে এ পদ্ধতি বাস্তবায়নের সুপারিশ করেছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সে সুপারিশ বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করে নাই।

টিআরএম বাস্তবায়নের উপকারিতা

- জলাবদ্ধতা সমস্যা দূরীভূত হবে।
- পলি পড়ে বিল ভরাট হয়ে সারা বছর বিল চাষাবাদের উপযোগী হবে।
- ভরাটকৃত বিলগুলো হবে উর্বরভূমি এবং সম্পূর্ণ বন্যামুক্ত।
- টিআরএম চলাকালীন সময়ে টিআরএম বিল এবং নদী মাছসহ বিভিন্ন জীববৈচিত্র্যের বিচরণক্ষেত্রে পরিণত হবে। বিল ভরাট হওয়ার পর গবাদিপশু সহ বিভিন্ন স্থল প্রাণীরা বিলে বিচরণ করতে পারবে। বিল ভায়না ও ডাকাতিয়া বিলে বাস্তবায়িত টিআরএম এক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট উদাহরণ।
- ভূগর্ভস্থ পানির স্তর বৃদ্ধি পাবে। এতে আর্সেনিক সমস্যা ও সেচ সমস্যার প্রশমন ঘটানো যাবে।
- নৌ চলাচল বৃদ্ধি পাবে।
- সর্বোপরি অনুকূল আবহাওয়া ও জলবায়ু গঠনে টিআরএম হবে সহায়ক।

জনগণ কর্তৃক জেঠুয়া বিলে টিআরএম বাস্তবায়ন

সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার জালালপুর ইউনিয়নে জেঠুয়া বিলটি অবস্থিত। জেঠুয়া, কৃষ্ণকাটি এবং চর কানাইদিয়া গ্রামের আংশিক এলাকা নিয়ে এ বিলটি গঠিত। বিলটির আয়তন ১৮০ হেক্টর। বিলে আমন ও বোরো উভয় ধরণের চাষাবাদ হয়ে থাকে। বিলটি কপোতাক্ষ নদের তীরে অবস্থিত। জলাবদ্ধতা এ বিলের অন্যতম সমস্যা।

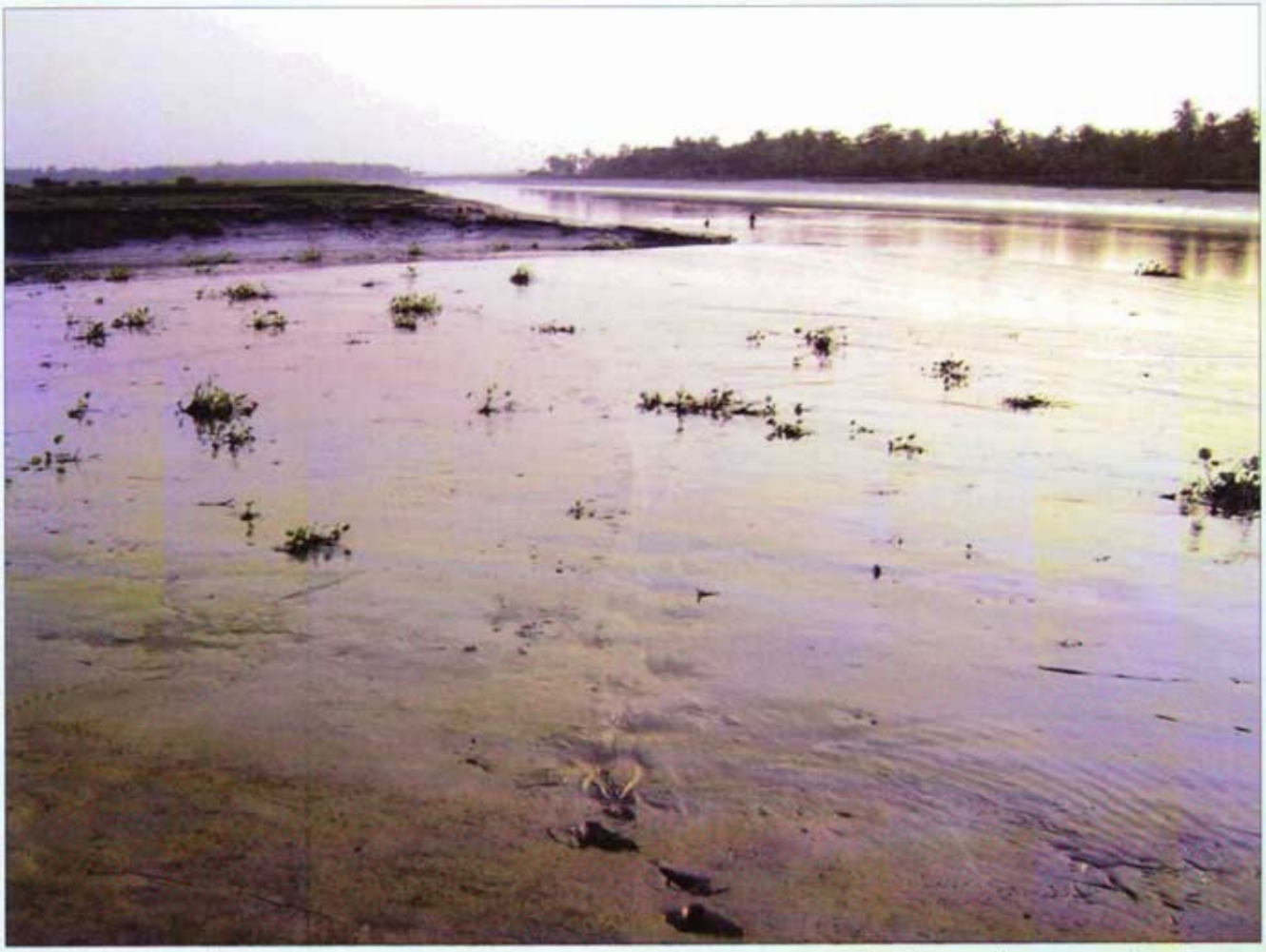

জেঠুয়া বিলে টিআরএম কার্যক্রমের মাধ্যমে পলিভরাটের অবস্থা

স্থানীয় জনগণ ২০০৯ সালে পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধ কেটে এ বিলে জোয়ার ভাটা চালু করে। মাত্র ৭মাস এ বিলে জোয়ার ভাটা চালু ছিল। তাতে বিলের সর্বত্র গড় ১মিটার পলি জমে ভূমি উঁচু হয়েছে এবং বিলের সর্বত্র যে অসমতল ছিল তা যথেষ্ট মাত্রায় দূর হয়েছে এবং নদী প্রায় বোয়ালিয়া পর্যন্ত যথেষ্ট গভীর হয়ে যায়। কিন্তু ঐ বছরের আইলার আঘাতে বিলের পাশে বসতি এলাকায় জলোচ্ছ্বাস দ্বারা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সংঘঠিত হয় যার দরুণ পুনরায় বাঁধের কাটা অংশ বেঁধে দেওয়া হয়।

বর্তমান টিআরএম প্রস্তাবনা

২০০৯ সালে জনগণের প্রচ্চাবনা ছিল সরকারী ভাবে জেঠুয়া বিলে টিআরএম বাচ্চবায়ন করা হোক, পরবর্তীতে প্রচ্চাব করা হয় জালালপুর বিল। এখন এই দুটি বিলে টিআরএম বাস্তবায়নের অনুকূল সুযোগ নেই। কেননা টিআরএম বাস্তবায়নের জন্য যে পরিমাণ জোয়ারের প্রয়োজন এই বিল দুইটির নদী এলাকায় এখন আর সে পরিমাণ জোয়ারের আগমন ঘটেনা। এখন জনগণের দাবী আরো দক্ষিণে পাখিমারা বিলে টিআরএম চালু করা হোক। জনগণ টিআরএম বাস্তবায়নে যে সব বিষয়গুলো যুক্ত করার দাবী জানায় তা হলো:

- গ্রাম প্রতিরক্ষা বাঁধ নির্মাণ যাতে জোয়ারের পানি বসতি এলাকায় প্রবেশ করতে না পারে। বাঁধের উপর বনায়ন সৃষ্টি করা।
- যেহেতু টিআরএম চলাকালীন সময়ে বিলে ফসল চাষাবাদ করা সম্ভব নয় সে কারণে ফসলের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা।
- বিলে যাদের জমি নাই অথচ বিলের উপর নির্ভরশীল তেমন ধরণের শ্রমজীবী অসহায় দুঃস্থ মানুষদের জন্য বিভিন্ন ধরণের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- জন সাধারণের চলাচলের জন্য কাঁচা পাকা রাস্তার উপর ব্রীজ নির্মাণ।
- অভ্যন্তরীন খালের দুই পার্শ্বে ভেড়ীবাঁধ নির্মাণ করে পলিকে দূরবর্তী এলাকায় পৌছানোর ব্যবস্থা করা এবং সমস্ত বিলে যাতে প্রায় সমভাবে পলি পৌছাতে পারে তার ব্যবস্থা করা।
- কাট পয়েন্টের উপরে নদীতে ক্রসড্যাম দেওয়া যাতে সমস্ত পলি টিআরএম বেসিনে প্রবেশ করতে পারে।
- বিলে মৎস্য সম্পদের ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
- লবণ সহনশীল ধান, মেলে ও কাঁকড়া প্রভৃতির চাষাবাদ করা।
- বর্ষার পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা এবং
- জনগণের সমন্বয়ে বিল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা।

২০১১'র জলাবদ্ধতায় ডুবে যাওয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়

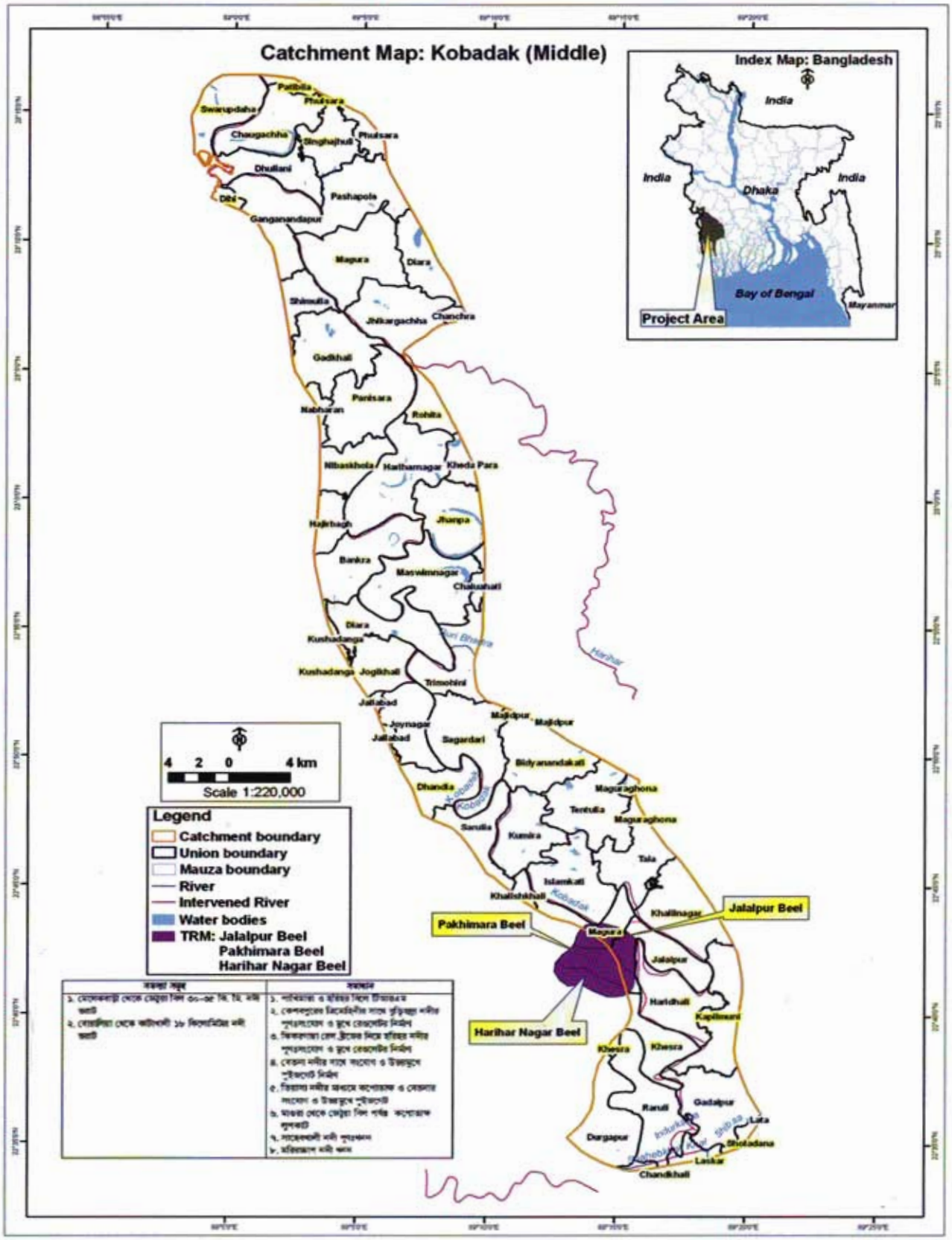
Catchment Map: Kobadak (Middle)
Index Map: Bangladesh
India
India
India
Dhaka
Bay of Bengal
Mayanmar
Project Area
Patibila
Phulsara
Swarupdaha
Chaugachha
Singhajhuli
Phulsara
Dhuliani
Dihi
Pashapole
Ganganandapur
Magura
Diara
Shimulia
Jhikargachha
Chanchra
Gadkhali
Panisara
Nabharan
Rohita
Nibashkhola
Harihamagar
Kheda Para
Hajirbagh
Jhanpa
Bankra
Maswinnagar
Chaluahati
Diara
Kushadanga
Kushadanga
Jogikhali
Trimohini
Jallabad
Jaynagar
Jallabad
Segardari
Majidpur
Majidpur
Bidyanandakati
Dhandia
Magaraghona
Tentulia
Magaraghona
Sarulia
Kumira
Tala
Islamkati
Khalishkhali
Khalinagar
Jalalpur Beel
Pakhimara Beel
Magura
Jalalpur
Haridhali
Kapilmani
Harihar Nagar Beel
Khesra
Khesra
Ranali
Gadalpur
Lata
Dargapur
Sholadana
Laskar
Chandikhali
Harihar
Kobadak
4 2 0 4 km
Scale 1:220,000
Legend
Catchment boundary
Union boundary
Mauza boundary
River
Intervened River
Water bodies
TRM: Jalalpur Beel
Pakhimara Beel
Harihar Nagar Beel
CEGIS

খেসরা ও জালালপুর ইউনিয়নের পাখিমারা বিলে প্রস্তাবিত টিআরএম স্পট

নদী খনন

এলাকার মানুষের জোর দাবী কপোতাক্ষ নদ খনন করা হোক। অতীতে ড্রেজার দিয়ে একাধিকবার নদী খনন করা হয়েছে তাতে তেমন কোন ফলাফল অর্জিত হয়নি। সে জন্য মানুষের দাবী ঝুঁড়ি-কোদাল দ্বারা নদী খনন করতে হবে। এতে অতিদ্রুত নদী খনন যেমন সম্ভব হবে, তেমনি কাজের গুণগত মান ভাল হবে এবং ব্যাপকভাবে এলাকার দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। একদিকে পাখিমারা বিলে টিআরএম এবং অন্য দিকে ক্রসড্যাম দিয়ে নদী খনন দুটি কাজ একসাথে করতে হবে। নদীতে ক্রসড্যাম বা মাটির বাঁধ দেওয়ার কারণে যথেষ্ঠ গতিবেগ নিয়ে পানি টিআরএম বিলে প্রবেশ করতে পারবে এবং জোয়ারে আগত সমস্ত পলির অনুপ্রবেশ ঘটবে বিলের মধ্যে। ক্রসড্যাম না দেওয়া হলে বিলবাসী প্রত্যাশিত পলি প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবে, বিল ভরাট হতে অনেক সময় লাগবে এবং উজান এলাকার নদী দ্রুত পলি দ্বারা ভরাট হবে। নদী খননের জন্য যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজনঃ

- সাগরদাঁড়ির সুড়িঘাটা থেকে খেসরা ইউনিয়নের বালিয়া স্লুইজ গেট পর্যন্ত নদী খনন করতে হবে।
- নদী থেকে সকল ধরণের দখল উচ্ছেদ করে যথাসম্ভব সি.এস রেকর্ড অনুযায়ী নদী খননের ডিজাইন করতে হবে।
- নদী খননের পলিমাটি যত্রতত্র স্তুপ করা ঠিক হবে না। তাহলে জোয়ারের বা বর্ষার পানিতে ধুয়ে এসে আবার নদীতে পড়বে। নদী কাটা মাটি দিয়ে রাস্তা তথা বাঁধ নির্মাণ করতে হবে এবং বাঁধে বনায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।
- নদী খনন সম্পন্ন হওয়ার পর সকল ধরনের ক্রসড্যাম যথাযথভাবে অপসারণ করতে হবে এবং নদীর মধ্যে কোথাও উঁচু অংশ রাখা যাবে না।
- কাজের গুণগত মান ও উদ্ভুত বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলার জন্য জনগণকে সম্পৃক্ত করে একটি মনিটরিং বা সুপারভিশন টীম গঠন করতে হবে।
- নদী খননের কাজ কন্ট্রাকটরের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে করতে হবে। এতে কাজের গুণগত মান রক্ষা, জনগণের অংশগ্রহণ এবং উত্তোলিত মাটি স্তুপের ব্যবস্থাপনা কাজটি সহজ হবে।

মাথাভাঙ্গা নদীর সাথে সংযোগ সাধন

প্রায় দেড়শো বছর আগে মাথাভাঙ্গার সাথে কপোতাক্ষের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এখন আর পদ্মার পানি কপোতাক্ষে প্রবেশ করে না। সরকারীভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করলে মাথাভাঙ্গার সাথে কপোতাক্ষের সংযোগ দেওয়া সম্ভব। বর্ষা মৌসুমে পদ্মার পানি মাথাভাঙ্গায় প্রবেশ করে। মাথাভাঙ্গার অববাহিকা খুব উঁচুতে অবস্থিত। এ উঁচু অংশ থেকে সারা বছর পানি চুঁইয়ে এসে মাথাভাঙ্গায় একটি ক্ষীণ ধারা সৃষ্টি করে। মাথাভাঙ্গার পানি এখন সম্পূর্ণ পশ্চিমবঙ্গ অংশে প্রবেশ করে যার সুফল কিছুটা পাওয়া যায় বাংলাদেশের সীমান্ত নদী ইছামতিতে। ইছামতির সাথে এই সংযোগ থাকার কারণে ইছামতির পার্শ্ববর্তী অন্যান্য নদী থেকে ইছামতির নাব্যতার অবস্থা তুলনামূলক ভালো।

কপোতাক্ষের উপরের অংশ ভৈরব অববাহিকার দামুড়হুদা, দর্শনা, জীবননগর, মহেশপুর, কোটচাঁদপুর, প্রভৃতি এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবী মাথাভাঙ্গার সাথে ভৈরব নদীর সংযোগ এবং ভৈরব নদীর পুনঃখনন। উল্লেখ্য যে এইসব এলাকায় নদী ভরাট ও বেদখল হওয়ায় জলাবদ্ধতা সমস্যা রয়েছে। তাছাড়া এসব এলাকায় শুকনো মৌসুমে প্রচণ্ড খরা বিদ্যমান।

স্লুইস গেটের মুখ আটকে দিয়ে অবাধ পানি চলাচল ব্যাহত করা, ছবিটি মাগুরাঘোনা কাঞ্চনপুর এলাকার

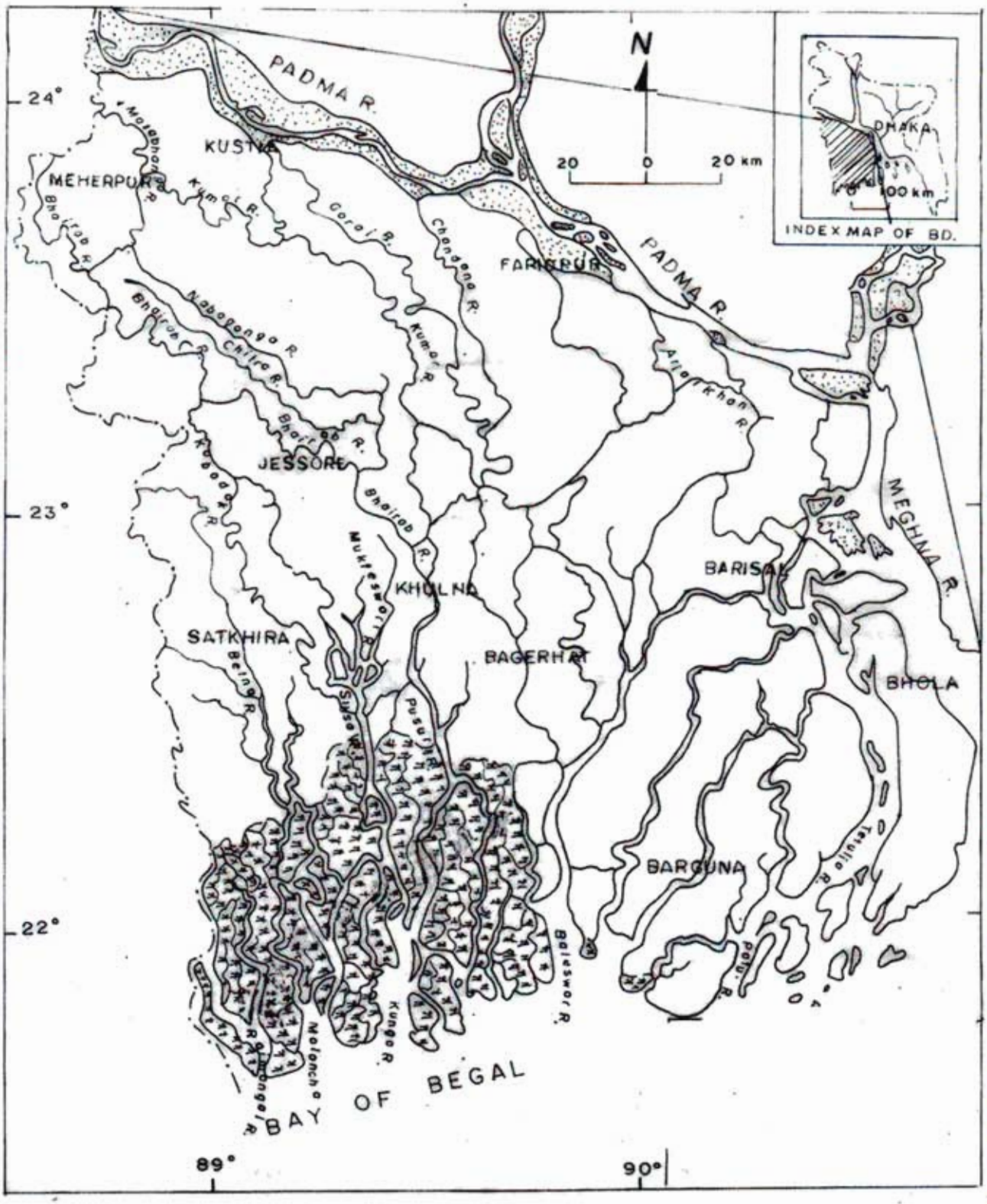

DRAINAGE MAP OF THE SOUTH WESTERN PART OF BANGLADESH

মাথাভাঙ্গার সাথে সংযোগ হলে প্রত্যাশিত ফলাফল

- কার্যকরীভাবে জলাবদ্ধতা সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভব হবে।
- জোয়ার ভাটা অঞ্চলে লবণাক্ততা হ্রাস করা সম্ভব হবে।
- ভূপৃষ্ঠ ও ভূগর্ভস্থ পানির স্তর বৃদ্ধি পাবে।
- ভৈরব এবং কপোতাক্ষ অববাহিকায় প্রায় ৫০টির মতো বাওড় আছে। বর্ষা মৌসুমে বাওড়ে পানি সংরক্ষণ করে একদিকে সেচ কাজে অন্যদিকে বাওড়গুলো জীববৈচিত্র্যের অভয়ারণ্য হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারবে। বাওড়ে পানি সংরক্ষণ সম্ভব হলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় খরা মোকাবেলায় সহায়ক হবে। এলাকায় স্বাস্থ্যগত পরিবেশ এবং অনুকূল আবহাওয়া ও জলবায়ু গঠনে বাওড়গুলো বিশেষ ভূমিকা রাখবে।
- নদীতে নৌচলাচলের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

আন্তঃনদী সংযোগ

নদী কখনও একাকি টিকে থাকতে পারে না। যে কোন নদীর থাকে শাখানদী ও উপনদী। পোল্ডার ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং উজান থেকে বিচ্ছিন্নতার কারণে কপোতাক্ষ অধিকাংশ শাখা ও উপনদী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এসব শাখানদী ও উপনদীর সাথে যতদূর পারা যায় সংযোগ দেওয়া সম্ভব হলে এর দ্বারা বহুমুখী উপকার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এতে প্রতিটা নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি পাবে, সেচ কাজে নদী গুলোকে ব্যবহার করা যাবে, জলাবদ্ধতা-নদীভাঙ্গন সমস্যার প্রশমন ঘটবে, মৎস্য সম্পদের প্রাচুর্যতা ও নৌ-চলাচল বৃদ্ধি পাবে, জীববৈচিত্র্যের উন্নয়ন ঘটবে, ভূ-পৃষ্ঠে ও ভূগর্ভের পানির স্তর বৃদ্ধি পাবে, জলোচ্ছ্বাস ও বন্যার আঘাত প্রশমিত হবে এবং এলাকায় অনুকূল আবহাওয়া ও জলবায়ু গঠনে সহায়ক হবে।

তালার ব্রীজ

যেসব আন্তঃনদী সংযোগ দেওয়া সম্ভব ঃ

- মহেশপুর শহরের পশ্চিমে সায়েরীঘাট থেকে ভৈরবের সাথে বেতনা নদীর সংযোগ।
- চীগাছার তাহিরপুর থেকে পূর্বদিকে যশোর অভিমুখী ভৈরব নদীর সাথে সংযোগ।
- ঝিকরগাছার কপোতাক্ষ থেকে হরিহর নদীর সাথে সংযোগ।
- কেশবপুরের ত্রিমোহিনী থেকে বুড়ীভদ্রা নদীর সাথে সংযোগ

- কপিলমুণি কপোতাক্ষ থেকে নাসির খালের মাধ্যমে সালতা নদীর সাথে সংযোগ।
- রাড়ুলীর বিচ্ছিন্ন ও ভরাট হওয়া কপোতাক্ষ নদ খনন করে মূল কপোতাক্ষের সংগে সংযোগ।
- শালিখা ও পাকুড়িয়া নদীর মাধ্যমে কপোতাক্ষের সাথে বেতনা নদীর সংযোগ।

উল্লেখ্য যে উল্লিখিত নদী-শাখানদী-উপনদী ছাড়া এ ধরণের আরো অনেক সংযোগ দেওয়া সম্ভব যা অনুসন্ধানের বিষয়। উজানের নদীগুলো মাথাভাঙ্গা নদীর সাথে যুক্ত করে সংযোগ দিতে হবে এবং নিম্নের জোয়ারভাটার নদীগুলোর সংযোগ হবে জোয়ারের সাথে।

নদী খাল দখল ও নিষ্কাশন পথের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা দূর করা

পানি নিষ্কাশনের অন্যতম মূল সমস্যা নদী খালে বিভিন্ন ধরণের হস্তক্ষেপ ও স্লুইজ গেটগুলো সংস্কার না করা। এলাকার নদ-নদী দ্রুত ভরাট হচ্ছে এবং সাথে সাথে তা দখলে চলে যাচ্ছে। বেদখলকৃত জমিতে ঘের-বেড়ী নির্মাণ, ফসল চাষাবাদ, ইটের ভাটা, বাড়ীঘর নির্মাণ এমনকি অনেক জায়গায় স্থাপনা গড়ে তোলা হয়েছে। জেগে উঠা চরকে শ্রেণী পরিবর্তন করে বন্দোবস্ত প্রদান করা হচ্ছে।

পাইকগাছার শিববাড়ী থেকে দর্শনার চেকপোষ্ট পর্যন্ত নদীর বুকে ৪৪/৪৫ টি ব্রীজ নির্মাণ করা হয়েছে। অধিকাংশ ব্রীজ পিলার যুক্ত। নদীর দুই পাশ যথাসম্ভব বেঁধে ব্রীজগুলো ছোট করে নির্মাণ করা হয়েছে ব্যয় সাশ্রয় এবং সহজে নির্মাণ করার জন্য। এসব ব্রীজের কারণে নদীর প্রস্থ ৫০-৭০ ভাগ পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে। সম্প্রতি নির্মিত তালা ও কপিলমুনি ব্রীজের কুফল মানুষ স্বচক্ষে অবলোকন করেছে।

নদী নাব্যতা হারিয়ে খেয়া চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। সেই সব জায়গায় রাতারাতি অনেক বাঁশের সাঁকো বা চার নির্মিত হয়েছে। এগুলো ব্রীজগুলোর তুলনায় অনেক বেশী নিষ্কাশন ক্ষমতাকে ব্যহত করেছে। সাঁকোগুলো নির্মাণের জন্য নদীর বুকে অল্প ব্যবধানে অনেক খুঁটি পোতা হয়। কচুরিপানা, শ্যাওলা সহ বিভিন্ন আবর্জনা এসে খুঁটিতে বেঁধে থাকে। এর ফলে সাঁকো ব্রীজের আগে পিছে নদীর পলি ভরাটের পরিমাণ অনেক বেশী হয়।

কপোতাক্ষের গোনালী খেয়াঘাটে নির্মিত সাঁকো

বিভিন্নভাবে নদীর মধ্যে মৎস্য আহরণ করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে বিপজ্জনক হলো ভেমটি জাল, কারেন্ট জাল, নদীর বুকে পাটা দেওয়া, কোমর দেওয়া ইত্যাদি। এগুলোর উপর কারো কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এতে একদিকে যেমন নদীর প্রবাহের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে অন্যদিকে ঐসব স্থানে অধিকহারে পলি জমে নদীর তলদেশ অসমতল হয়ে পড়ছে।

পানি নিষ্কাশনের জন্য কচুরিপানাও বড়ো ধরণের একটা সমস্যা। বর্ষার পানি যতো বৃদ্ধি পায় সেই তালে তালে কচুরিপনাও অতিদ্রুত হারে বাড়তে থাকে। বাড়তে বাড়তে বিশেষ করে বহু জলাশয় এলাকায় এতো বৃদ্ধি পায় যা অতিক্রম করে নৌ চলাচল করা সম্ভব হয়ে উঠেনা। এগুলোর কিছু কিছু স্রোতের টানে ভাটিতে এসে ব্রীজ সাঁকো জালে পাটায় বেঁধে থাকে।

বিলের মধ্যে অভ্যন্তরীণ খালেও রয়েছে বিভিন্ন সমস্যা। কচুরিপনা, শ্যাওলা, বেদখল করে খাল সংকুচিত করা, খালের মধ্যে পাটা কোমর দেওয়া, স্লুইজ গেটের মুখে জাল পেতে মাছ ধরা, ঘেরের মধ্যে খাল অবরুদ্ধ করে ফেলা এবং বিভিন্ন জায়গায় খালের উপর অপ্রশস্ত ব্রীজ-কালভার্ট নির্মাণ এবং স্লুইজ গেটের আগে পিছে পলি ভরাট প্রভৃতি কারণে অভ্যন্তরীণ পানি ঠিকমত নিষ্কাশিত হতে পারে না।

স্লুইজ গেটগুলোর যান্ত্রিক ত্রুটি বিচ্যুতি নেই এমন কোন স্লুইজ গেট খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। গেটগুলোর সবথেকে বড় সমস্যা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সমস্যা। জনস্বার্থে স্লুইজগেটগুলো পরিচালিত হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘের মালিকেরা ও মৎস্য শিকারীরা তাদের স্বার্থে স্লুইজগেটগুলো উঠানামা করায়। ইজ গেটগুলোর সাধারণ সমস্যা হলো কপাটের সমস্যা, অনেক গেটের কপাট ছিদ্রযুক্ত, রবার সীল ও ছোটখাটো নাটবল্টু সমস্যা লেগেই আছে। যথানিয়মে যন্ত্রপাতিতে তেল দেওয়া হয় না। এবং কপাট সমূহ রং করা হয় না।

নদীতীরে অনেক জায়গায় বিশেষ করে নিম্নাংশে কোন নিয়ন্ত্রিত কাঠামো নেই। ঐসব এলাকায় খালদ্বারা জোয়ারের পানি বা বর্ষার পানি প্রবেশ করে এলাকা প্লাবিত করে থাকে।

জনগণের অংশগ্রহণ ও লোকায়ত জ্ঞানের ব্যবহার

আর এই বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনাকারী, বাস্তবায়নকারী সংগঠন, সরকার ও প্রশাসন কাজ করলে অধিক সুফল পাওয়া যাবে। পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জনগণের আগ্রহ, উৎসাহ ও উদ্দীপনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে পরিমাণ পাওয়া যাবে অন্য কোন কর্মকান্ডে তা সম্ভব নয়। এ সমস্যা মানুষের জীবিকার সমস্যা, বসবাসের সমস্যা এবং চলাচলের সমস্যা। সমস্যা দ্বারা মানুষ জর্জরিত, নিষ্পেষিত এবং দিশেহারা। সুতরাং সমস্যা সমাধানে মানুষকে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হলে মানুষ যে পরিমাণ সাড়া দেবে তা হবে অভাবনীয় এবং অভূতপূর্ব। আমরা সকল মহলকে এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে আন্তরিকভাবে আহবান জানাচ্ছি।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জনগণের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। এ কথা বলাবাহুল্য যে-বাংলাদেশ পানির দেশ। পানির সাথে সমঝোতা করে, লড়াই সংগ্রাম করে, বন্ধুত্ব করেই এখানকার মানুষ পানির সাথে বসবাস করছে। সুতরাং পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়টি তাদের অস্তিত্ব রক্ষার বিষয়টির সাথে জড়িত। এ কাজে জনগণের অর্জিত অভিজ্ঞতার মূল্য অপরিসীম। সংশ্লিষ্ট সকলের উচিত জনগণের এ অভিজ্ঞতার উপর শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং যে কোন পরিকল্পনা প্রণয়নে এ জ্ঞানের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা। অতীতে এ লোকায়ত জ্ঞানকে উপেক্ষা করা এবং কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ না হওয়াতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড দ্বারা এলাকার মানুষকে ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হয়েছে। প্রায় ক্ষেত্রে ঘটেছে উন্নয়ন বিপর্যয় (Development Disaster)। এলাকার মানুষ এইসব ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি চায় না।

কপোতাক্ষ প্রকল্প পর্যালোচনা

২০০০ সাল থেকে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা সমাধানের লক্ষ্যে একের পর এক বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে চলেছে যার মধ্যে উলেখযোগ্য হলো ঃ ড্রেজার দ্বারা নদী খনন, ঝুড়ি কোদাল দ্বারা নদী খনন, এক্সকাভেটর ও ড্রেজার মেশিন দ্বারা নদীতে প্রণালী সৃষ্টি প্রভৃতি। এ কর্মসূচীগুলো সবই ছিল জরুরী কর্মসূচী, সাময়িকভাবে জলাবদ্ধতা প্রশমন ছিল এই সব কর্মসূচীর লক্ষ্য। স্থায়ীত্বশীল এবং স্থায়ী কর্মসূচীর জন্য ২০০৪ সালে CEGIS (Centre For Environment & Grogaphical Information) তার স্টাডি রিপোর্টে ঝাঁপার বাওড়ে জোয়ারাধার বা টিআরএম কার্যক্রমের সুপারিশ করে। কিন্তু পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে ওই সুপারিশ বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়ের সাথে মিটিং

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে জরুরী যেসব কর্মসূচী বাচ্চবায়ন করা হয়েছে তাতে কোন কোন ক্ষেত্রে সাময়িক কিছু উপকার পাওয়া গেলেও পরিণামে সমস্যা আরো বিস্তৃত ও জটিল হয়েছে। প্রতিবছর উজান এলাকা থেকে পলি জমে কপোতাক্ষ ৮ থেকে ১০ কি.মি করে অকালমৃত্যুর কবলে পড়েছে। এমতাবস্থায় উত্তরণ ও পানি কমিটির পক্ষ থেকে স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের এ্যাডভোকেসী কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মহোদয়ের আন্তরিক ভূমিকায় কপোতাক্ষ নদের সমস্যা সমাধানে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং তার দুটি বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান IWM (Institute of water Modelling), CEGIS, পানি কমিটি এবং কপোতাক্ষ বাঁচাও আন্দোলন কমিটির যৌথ সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে কপোতাক্ষের স্থায়ী সমাধানের জন্য একটি ষ্টাডি কাজ সম্পন্ন করতে হবে। ষ্টাডিকাজে সময়ের প্রয়োজন এক বছর এবং প্রকল্প প্রণয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় যেতে আর এক বছর সময়ের প্রয়োজন হবে। এই দুই বছরের মধ্যে সমস্যা প্রশমনের জন্যে একটি অন্তর্বর্তী নিষ্কাশন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন নিষ্কাশন পরিকল্পনা

সিদ্ধান্ত হয় যে অন্তর্বর্তীকালীন নিষ্কাশন পরিকল্পনার জন্য প্রধানতঃ ২টি বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে ১. বিল জেঠুয়া ও হরিদাশকাটি বিলে টিআরএম বা জোয়ারাধার কার্যক্রম বাস্তবায়ন। ২. এই বিল ২টির উপর ক্রসড্যাম দিয়ে কপিলমুনির গোলাবাড়ী থেকে সুড়িঘাটা পর্যন্ত (৩৫ কি.মি.) নদী খনন করা। সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান IWM এবং CEGIS কে নিযুক্ত করা হয় পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য। উভয় প্রতিষ্ঠান জনগণের সাথে মতবিনিময় করে বিল জেঠুয়ায় টিআরএম বাস্তবায়ন এবং প্রয়োজীয় নদী খননের সুপারিশ করে।

জেঠুয়া বিলে টিআরএম বাস্তবায়নে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য CEGIS কর্তৃক মিটিং

ইতিমধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরিবর্তে মহাজোট সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। এরপর অন্তবর্তী নিষ্কাশন পরিকল্পনা ধামাচাপা পড়ে যায়। জনগণ নিজেদের উদ্যোগে বিল জেঠুয়াতে টিআরএম বাস্তবায়ন করে। জরুরী কর্মসূচী হিসাবে সরকারের পক্ষ থেকে নদীর ভরাট হওয়া উঁচু অংশে নিষ্কাশন প্রণালী সৃষ্টি করার জন্য ড্রেজার ও এক্সকাভেটর মেশিন দ্বারা খননের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে নিষ্কাশন প্রণালী সৃষ্টি কার্যক্রম দ্বারা আশাব্যঞ্জক তেমন কোন ফল পাওয়া যায়নি। তবে বিল জেঠুয়ায় জনগণ বাস্তবায়িত টিআরএম বাস্তবায়নে যে ফলাফল পাওয়া গেছে তা অভাবিত। ৭ মাসে বিল প্রায় ১ মিটার উঁচু হয়েছে এবং ভাটিতে বহুদূর পর্যন্ত কপোতাক্ষ নদ নাব্য হয়েছে, তা না হলে কপোতাক্ষের দুরবস্থা শিববাড়ী পর্যন্ত সম্প্রসারিত হতো।

কপোতাক্ষ নদের সমীক্ষা

কপোতাক্ষ নদের স্থায়ীত্বশীল সমাধানের লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সমীক্ষার জন্য IWM এবং CEGIS এর উপর দায়িত্ব অর্পণ করে। জলাবদ্ধতা ও বন্যা প্রতিরোধে স্থায়ীত্বশীল কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে সে বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন করার দায়িত্ব অর্পিত হয় IWM এর উপর। IWM প্রণীত ব্যবস্থাবলী বাস্তবায়িত হলে পরিবেশ ও সামাজিক বিষয় সমূহে কি ধরণের প্রভাব পড়তে পারে সে বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন করে CEGIS।

IWM ও পানি কমিটি কর্তৃক জনমত সমীক্ষা

IWM এর অনুরোধের প্রেক্ষিতে IWM এবং পানি কমিটি যৌথভাবে জনমত সংগ্রহের কাজটি সম্পন্ন করে। জনমত সংগ্রহের এলাকা ছিল চৌগাছার তাহিরপুর থেকে সুন্দরবন সংলগ্ন বেদকাশি ইউনিয়ন পর্যন্ত। নির্দিষ্ট ওই এলাকার মধ্যে চারটি মত বিনিময় সভা করা হয়, কপিলমুনি পাবলিক লাইব্রেরী, পাইকগাছার মৎস্য সম্পদ ইনস্টিটিউট, সাগরদাঁড়ি পর্যটন কেন্দ্র এবং ঝিকরগাছা উপজেলা অডিটরিয়ামে। এছাড়া উত্তরণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় IWM প্রণীত পরিকল্পনার উপর মত বিনিময় সভা। বিভিন্ন মতবিনিময় সভায় অংশ গ্রহণকারীরা ছিলেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, IWM, CEGIS, ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ, প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রতিনিধি, স্থানীয় উদ্যোগী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবৃন্দ, আন্দোলনকারী সংগঠন, এনজিও, কৃষক, ভূমিহীন, মৎস্যজীবী, সাংবাদিক, শিক্ষক প্রভৃতি।

বিভিন্ন মত বিনিময় সভায় দেখা যায় যে জনগণ চায় প্রকল্পের এলাকা ধরা হোক মাথাভাঙ্গা নদী থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত। প্রকল্পে টিআরএম অন্তর্ভূক্ত করা হোক এবং ঝুড়িকোদাল দ্বারা নদী খনন করা হোক। পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতীত কর্মকাণ্ডের জন্য জনগণ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতি ক্ষুব্ধ। কাংখিত ফলাফল অর্জিত না হওয়ার পিছনে প্রকল্পে দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা অন্যতম কারণ বলে জনগণ মনে করে। তাছাড়া জনগণের জোর দাবী প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

২০১০ সালে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ শুরু না হওয়া

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২০১০-১১ অর্থ বৎসরে কপোতাক্ষ নদ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এডিপিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। কিন্তু প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়ার ধীর গতির কারণে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এতে যে সমস্যা সৃষ্টি তাহলো ২০১০ সালের বর্ষা মৌসুমে ব্যাপক জলাবদ্ধতা দেখা দেয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন এক বছর পিছিয়ে যাওয়ার কারণে এলাকার পরিস্থিতি ভিন্নতর রূপ নিতে থাকে। এখন পূর্বোক্ত প্রকল্প দ্বারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ দুরুহ হয়ে উঠতে পারে। এমতাবস্থায় সমস্যা মোকাবেলায় উত্তরণ ও পানি কমিটির পক্ষ থেকে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২০১০ সালে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা এবং সম্ভব না হলে এলাকাকে রক্ষা করার জন্য জরুরীভিত্তিতে অন্তবর্তীকালীন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা।

অনুমোদিত প্রকল্প

ইতিমধ্যে একনেক বৈঠকে জনগণের বহু প্রত্যাশিত এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত 'কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)' অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ধরা হয়েছে ২০১১ সালের জুলাই থেকে ২০১৫ সালের জুন পর্যন্ত। ৪ বছর মেয়াদী প্রকল্পটির জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছ ২৬১ কোটি ৫৪লাখ ৮৩ হাজার টাকা। ২০১১-১২ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত পানি সম্পদ খাতভুক্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ৩২টি প্রকল্পের মধ্যে প্রকল্পটির অবস্থান ২য়'। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমিতে বলা হয়েছে 'কপোতাক্ষ নদ যশোর, সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। এর মোট দৈর্ঘ্য ২৪০ কিমি। Catchment ১.০২ লক্ষ হেক্টর। কপোতাক্ষ নদ অববাহিকায় জলাবদ্ধতা ও পলিভরাট অনেক বছর থেকে একটি প্রধান সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। কপোতাক্ষ নদের বিস্তৃত এলাকায় পলি পড়ার কারণে নিষ্কাশন ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। এর ফলে প্রলম্বিত জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। জলাবদ্ধতার কারণে অত্র এলাকার কৃষি উৎপাদন, কর্ম সংস্থানের সুযোগ, জনগণের আয়, মাছের চাষ, চারণভূমি, জীববৈচিত্র্য এবং প্রাণী সম্পদের উপর বিরূপ প্রভাব পড়েছে।

প্রকল্পের প্রস্তাবিত মূল কার্যক্রম

- পাখিমারা বিলের চারিপাশে ১০.২০ কিমি পেরিফেরিয়াল বাঁধ নির্মাণ করা।
- পেরিফেরিয়াল বাঁধে ২২ টি আউটলেট পাইপ নির্মাণ করা।
- ড্রেজার দ্বারা ১.৫০কিমি সংযোগ চ্যানেল খনন।
- সংযোগ খালের ১কিমি তীর সংরক্ষণ।
- সংযোগ খালের উপর একটি বেইলি ব্রীজ নির্মাণ।
- ড্রেজার দ্বারা ২৩ কিমি কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন, মেকানিক্যাল ৬৭ কিমি নদী পুনঃখনন এবং শ্রমিক দ্বারা নদের উভয় তীরে খননকৃত মাটি দ্বারা বাঁধ নির্মাণ।
- কপোতাক্ষ নদের মেইনটেন্যান্স ড্রেজিং ১০কিমি।
- ২০ কিমি বুড়ীভদ্রা নদী পুনঃখনন।
- ১১ কিমি গজশ্রীখাল খনন এবং উভয় তীরে বাঁধ নির্মাণ।
- ৯ কি,মি, শালিখা খাল পুনঃখনন।
- বিলের সাথে সংযোগের জন্য খাল খনন ৩১.৩০ কি,মি,।
- কপোতাক্ষ নদের উভয়তীরে বাঁধ নির্মাণ ১১.৫০ কিমি।
- পাইপ আউটলেট নির্মাণ ৩৬টি।
- বিদ্যমান রেগুলেটর মেরামত ২টি।
- মোশামপুর খালের উপর ২ ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণ ১টি।
- ক্লোজার ড্যাম নির্মাণ এবং অপসারণ ১টি ।
- এক্সকাভেটর ক্রয় ২টি।
- ভূমি অধিগ্রহণ ৮ হেক্টর।

প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য আমরা বাংলাদেশ সরকারকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। প্রকল্পটি সময়মতো এবং যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে যারা দীর্ঘদিন যাবৎ আন্দোলন সংগ্রাম করে যাচ্ছে তাদের অভীষ্ট আকাংখা অনেকটা পূরণ হবে এবং জনগণ দীর্ঘদিনের ভোগান্তির কবল থেকে রক্ষা পাবে। প্রকল্পটিতে জনগণের আশা আকাংখার যথেষ্ঠ প্রতিফলন ঘটেছে। তবে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সুফল কি পরিমাণ পাওয়া যাবে সেটি নির্ভর করছে প্রকল্পের সকল পর্যায়ে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনার উপর। এই মুহূর্তে পাখিমারা বিলের জনগণের সাথে টিআরএম নিয়ে মতবিনিময় শুরু করা দরকার। কেননা এ বিষয়ে ঐ বিল অধিবাসীদের সাথে পূর্বে কোন আলোচনা করা হয়নি। প্রকল্পে দেখা যায় যে জুলাই মাস থেকে প্রকল্প বাস্তবায়ন হওয়ার কথা। ইতিমধ্যে ৫/৬ মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। সে কারণে কাল বিলম্ব না করে দ্রুতভাবে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে অগ্রসর হতে হবে এবং শুকনো মৌসুমের মধ্যে টিআরএম এর যাবতীয় অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে, টিআরএম অবকাঠামো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্মাণ করা সম্ভব না হলে প্রকল্পের অগ্রগতি আর এক বছর পিছিয়ে যেতে পারে।

এই এলাকার জনগণের দীর্ঘদিনের দাবী ঝুঁড়িকোদাল দ্বারা নদী খনন। কিন্তু প্রকল্পের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে ড্রেজার এবং মেকানিক্যাল নদী খনন। ড্রেজার ও মেকানিক্যাল নদী খননের যে অভিজ্ঞতা জনগণ পূর্বে প্রত্যক্ষ করছে তা সুখকর নয়। জনগণ মনে করে ঝুঁড়ি কোদাল দ্বারা নদী খনন হলে দ্রুতভাবে দীর্ঘ নদী খনন সম্ভব হবে এবং এতে ভুক্তভোগী জনগণের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে এবং প্রকল্পের সংগে জনগণকে আরো বেশী সংযুক্ত করা সম্ভব হবে। বিষয়টি কর্তৃপক্ষের উচিত হবে গুরুত্ব দিয়ে ভেবে দেখা। জনগণের অন্যতম দাবী ছিল কপোতাক্ষের সাথে মাথাভাঙ্গা নদীর সংযোগ এবং রাড়ুলী থেকে বিচ্ছিন্ন কপোতাক্ষের সাথে পুনঃসংযোগ করা। এ কাজটির সাথে IWM এবং CEGIS সম্পৃক্ত হয়েছিল কিন্তু বিষয়গুলো প্রকল্প কার্যক্রম থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে গঙ্গা ব্যারাজ নির্মাণ হলে এ সমস্যার সমাধান হবে। কপোতাক্ষ প্রকল্প চলাকালীন সময়ে বিষয়টি নিয়ে পুনঃ চিন্তাভাবনা করা যায় কিনা আশা করি কর্তৃপক্ষ সেটিও ভেবে দেখবেন।

উত্তরণ

৪২, সাত মসজিদ রোড (৪র্থ তলা)
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন : ৮৮-০২-৯১২২৩০২
মোবা : ০১৭১১৮২৮৩০৫
ইমেইল : uttaran.dhaka@gmail.com
ওয়েব : www.uttaran.net